Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.08-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক প্রেমের আবেদনে মৈমনসিংহ গীতিকা

ইতিষা নন্দী
এম. এ. বাংলা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In the medieval age of Bengali literature 'Mayman Singha - Purba Banga' ballad are the literature of real life blending with usual joy and sorrow in the realm of traditional religious state. At the time of medieval period the ballads present the simple plea, self-respect and pure feelings of love of human being through their songs removing the discrimination between Hindu and Muslim. While faith in God is centered in the remaining customs of that period exempting all arguments the songs of ballads get the responsibility to express love, self-restraint and endurance of human beings. So, these ballads are known as a human being not as a particular Hindu or Muslim. This secular humanitarian plea promotes the songs of ballads from one person to whole humanity, particular religion to secularism. As a result the tone of world of literature rings in these ballads.

Keywords: Bengali literature, Maymansingha, Purba Banga, Traditional religious, Hindu and Muslim culture, Humanity, Secularism.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধারায় প্রচলিত ধর্মসাধনার ভিড়ে যেমন ঐতিহাসিক চেতনামন্ডিত সাহিত্যের দেখা মেলে না, তেমনি বাস্তব জীবনরসে সম্পৃক্ত ও দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ মিশ্রিত গীতিকার সন্ধানও অল্প পরিমানে ঘটে। এই স্বল্প সাহিত্য সম্ভারের তালিকায় মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারন প্রত্যন্ত গ্রামবাংলায় অবহেলিত মানব জীবন থেকে সংগৃহিত এই প্রেম কোনো মন্দির জুড়ে বসেনি, তা বিরাট আকাশের নীচে নীলবসন্ত প্রদেশে নিজেকে মুক্ত করেছে। তাই এই গীতিকাগুলিতে কোনো দেবতা বা ধর্মসাধনার স্বপ্নাদেশ অনুসরণের ইঙ্গিত নেই, আছে সমাজ গন্ডীর শৃঙ্খলামুক্ত পল্লী লোকজীবনের সঙ্গে বাস্তব ধর্ম নিরপেক্ষ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধারাপাত।

লোকসাহিত্য জন্মলাভ করে কৃত্রিমতা বিমুখ সহজ, সরল জীবনের মধ্যে থেকে। শিক্ষিত জীবনধারার তুলনায় অনুন্নত, অনগ্রসর জীবনধারার সাধারন নাম লোকজীবন। যার থাকে একটি নিজস্ব রীতি-নীতি, জীবনচর্যা, লোকভাষা ও সংস্কৃতি। এই সামগ্রিক মেলবন্ধনে যে রসসৌকর্যের সৃষ্টি হয় তাকেই বলে লোক-সাহিত্য। এই সাহিত্য ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর ছেড়ে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-কল্পনায় অভিব্যক্ত হওয়ায় রচনার আড়ালে রচয়িতার কন্ঠস্বর চাপা পরে যায়। মৈমনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি পার্থিব নর-নারীর সুখ-দুঃখ বিরাচিত প্রেমের আত্মত্যাগ ও অশ্রুবেদনার সজলে সিক্ত হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে মানবকেন্দ্রিক পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে। তাই মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা

সকলের প্রেম রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে ব্যর্থ হয়েও কোনো আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে সান্ত্বনার সন্ধান করেনি, বরং ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রেমকে সামনে রেখে নিয়ম জর্জরিত সমাজ শৃঙ্খলের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে।

তুর্কি আক্রমণের পর মধ্যযুগের বাংলায় সমাজ ও সাহিত্যে যে অরাজকতা, শাসক শ্রেনীর ক্রমাগত পরিবর্তন, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় পরিস্থিতির অস্থির অবস্থা উপনিত হয়েছিল তাতে সাধারন মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। এই অস্থির বিপন্নতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারন মানুষ দেব-দেবী ও শাসক শ্রেনীর কাছে দারস্থ হন। মনের মধ্যে জন্ম নেয় বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এরই ফলে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ধারা – মঙ্গলকাব্য, অনুসারী সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্যের ধারা। যা হয়ে উঠল ধর্মের মোড়কে মানুষের কথা। যেখানে ধর্ম মুখ্য, মানবতা গৌণ। এই ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য ধারার মধ্যে উঁকি দেয় নিতান্ত সাধারন মানুষের মাটির কথা। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আখাঙ্খা ও প্রেম-অপ্রেমের কথা। মানব হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা মানবতার সন্ধান দিতে ধর্মীয় পরিসরে এসে দাঁড়ায় মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত 'সৌরভ' নামক মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য অনুরাগী চন্দ্রকুমার দে কতৃক পূর্ববঙ্গ মৈমনসিংহ থেকে এই গীতিকার কয়েকটি লোকগাথা প্রকাশিত হলে, সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজ ও ব্যক্তির মুখের সাদরে গ্রহনীয় হয় এই সকল গাথা। অতঃপর এই গীতিকার কাব্যগুন সরল আন্তরিকতা , পল্লীর মেঠোসুর অনুভব করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রদ্ধেয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে এবং সাহিত্য ইতিহাসকার আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা,নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পালাগুলি সংগৃহীত ও মৈমনসিংহ গীতিকা নামে যত্নসহকারে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের সভ্যতার এক অংশ যখন মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব গীতিকবিতার সুরে সুর মেলাতে ব্যস্ত, বঙ্গীয় কবিগণ যখন চিরাচরিত একঘেঁয়েমি ধারায় পূর্বকবিদের দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসর্ণ করতে উৎসুখ তখন বাংলাদেশের সুদূর সীমান্তে নিরক্ষর অল্পশিক্ষিত কবিগণ ধর্মসাধনার গূঢ় তত্ত্ব ও ধর্মীয় প্রনালীর আঁটা আঁটি বেড়াজালকে ছিঁড়ে ফেলে মানব হৃদয়ের সরল আবেদন, আত্মমর্যাদা, ও গ্রাম্যনারীর হৃদয় প্রেমানুভূতিকে গীতিকার মাধ্যমে পরিবেশন করলেন। এই সব পালাগানের চরিত্রের পাশাপাশি শ্রোতাও হয়ে উঠলেন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। সময়টা মধ্যযুগ হলেও হিন্দু-মুসলিম যে বহু শতাব্দীকাল ব্যাপী পরস্পরের সঙ্গে কেবল প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল তার সন্ধান দেয় এই গীতিকাগুলির বন্দনা অংশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও চরিত্রগুলির মানবতা। সুতরাং এদের যদি কোনো পরিচয় হয়ে থাকে তবে এরা হিন্দু বা মুসলিম নয়, এরা মানুষ। কারন, এদের জীবন কোনো বিশেষ সমাজের শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ নিত্য মানবিক বৃত্তির দ্বারা এদের আচরন ও জীবন নিয়ন্ত্রিত। তাই এদের প্রেমে প্রতারনা, বিরহ, আঘাত ও পীড়ন থাকলেও 'প্রেম' নামক সার্বভৌম জীবন সত্যের কাছে নায়ক নায়িকারা কুলশীল, জাত্যাভিমান বিসর্জন, আত্মনিবেদন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রেমের অমরাবতী রচনা করেছে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহ থেকে যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি সমন্বিত জীবনমুখী পালাগানগুলি সংগ্রহ করে দিনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কে দিয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –

ক) দ্বিজকানাই প্রণীত মহুয়া পালা।

খ) অনুমানিত বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী প্রণীত মলুয়া পালা।

গ) নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রনীত চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র পালা।

ঘ) দ্বিজ ঈশান প্রণীত কমলা পালা।
ঙ) চন্দ্রাবতী প্রনীত দস্যু কেনারাম পালা।
চ) অজ্ঞাত কবি রচিত রূপবতী পালা।
ছ) অজ্ঞাত কবি রচিত ঈশা খাঁ দেওয়ান পালা।
জ) অজ্ঞাত কবি রচিত দেওয়ান ভাবনা পালা।
ঝ) অজ্ঞাত কবি রচিত কাজলরেখা পালা।
ঞ) মনসুর বয়াতি প্রণীত দেওয়ানা মদিলা পালা।
ট) রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ, বানিয়া ও নয়নচাঁদ ঘোষ – এই চার কবি রচিত কঙ্ক ও লীলা পালা।

জীবনের প্রতিরূপে রচিত হয়েছে মৈমনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতাকাগুলি। মানুষের জীবন রঙ্গশালায় দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার আদলে স্থান নিয়েছে গীতিকাগুলি, যা সমব্যথি পাঠকের মনে চিরকাল দাগ কেটে যায়। গীতিকাগুলির মধ্যে কোনো তত্ত্ব বা তথ্য নেই, বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় নেই, অর্থ খুঁজতে বুদ্ধির অভিধানে সন্ধান করতেও হয় না। গীতিকারগণ যেমনটি দেখেছেন তেমনটি রচনা করে গেছেন অন্তরের দরদ দিয়ে। তাই গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা যে কাহিনিগুলি দীর্ঘদিন অশ্রুসিক্ত হয়ে নিরীহ গ্রাম্যসরল প্রানকে আপ্লুত করেছিল সেই গাথাকেই পয়ারের রূপছাঁদে প্রান দিয়েছেন কবিগণ। আর তাতেই সহজ সরল ভাষার অনড়ম্বতার আমেজে স্নান সেরেছে গার্হস্থ্য জীবনমুখী মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও কমলার মত চরিত্রাবলী। দিনেশচন্দ্র সেন বলেছেন –

> *"নানা দিক দিয়া এই সব পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব মাধুর্য ঝরিয়া পরিতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভান্ডার নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের কাছে এত ভালো লাগিয়াছে।"*[১]

এই সকল গীতিকা যখন রচিত হয়েছিল তখন সামাজ ধর্মশাস্ত্রের নিগূঢ় বন্ধনে মানব জীবনের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল। প্রচলিত ছিল সমাজের বুকে সংস্কারের একাধিপত্য। সেই সকল ধর্ম সংস্কারের জীর্ন অচলায়াতনকে ভেঙ্গে ফেলে মৈমনসিংহ স্বতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলো ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়ে। তাই এই গীতিকা আমাদের যে নতুন জীবনের সাথে পরিচয় ঘটায় তা স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধি বিধান বহির্ভুত, যা উচ্ছ্বল প্রানাবেগের আভিঘাতে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের গন্ডিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। গীতিকাগুলির নায়ক-নায়িকার প্রেমে কোনো সমাজ নির্দিষ্ট কৃত্রিমতার বাঁধিবুলি নেই, হৃদয়ের সুপ্ত কোনে লুকিয়ে থাকা মেঠো সুর-ই বেজে উঠেছে। গীতিকার নায়ক নায়িকাদের প্রেমের অর্থ হল সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা। যা আর একধাপ এগিয়ে স্বামীরূপে পরিনতি লাভ করেছে। এখানে তাই বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মতো শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙ্গালী ঘরগুলিকে এত আঁটাআঁটি করে বাঁধেনি। পাষানচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি হয়নি। ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখার চেষ্টাও দেখা যায়নি। এই গীতিকাগুলিতে স্থান পেয়েছে নারী চরিত্রের পবিত্র প্রেমের দুর্জয় শক্তি। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে নায়ক-নায়িকারা এক দিকে যেমন গান্ধর্ব মতে অসবর্ণ বিবাহ করেছেন। আবার অন্যদিকে নিয়মের বাধাগুলির উপরে হৃদয়ের একাত্মাতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে আজন্ম কুমারী হয়েও থেকে গেছেন। কারন এই গীতিকার নারীরা ঘাগড়া পরা বিদেশীনির মতো মন্ত্র মুখস্থ করে বড় হয়নি। চিরকাল শাড়ী পরা ঘরের মেয়ের মতই প্রেম সুধায় বড় হয়েছেন। তাই এদের জীবন উপখ্যান

পরিপাটি শব্দের সোনালী চুমকি দিয়ে গড়া নয়, পল্লীবাংলার প্রেমসুরের আত্মদানেই রচিত হয়েছে। দীনেশ চন্দ্র সেন তাই বলেছেন –

> *"চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন – তাহা হোটেলের মসলা দেওয়া মুখরোচক বিলাসখাদ্য সম্ভার নহে, ইহা আমাদের পল্লী অন্নপূর্নার শ্রীকরকমলের দান – জীবনদায়ী অন্নব্যঞ্জন।"*[২]

বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয় কাব্যধারায় নর-নারীর পার্থিব প্রেম-মুলক রচনালেখ্য হিসেবে মৈমনসিংহ গীতিকায় সনাতন হিন্দু ধর্মের পতিব্রত্যের ধারা অনুসরন হয়নি, হৃদয়ের অনুশাসন অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাই হৃদয়ের কাছে ধর্মের অনুশাসন ভেঙ্গে গেছে, সহজ-সরল পার্থিব প্রেমের কাছে দৈব শক্তির ভারাক্রান্ত শিকল শিথিল হয়ে গেছে। মধ্যযুগের দৈব বিশ্বাসের কেন্দ্র-স্থলে বসে কেবল এই সাহিত্য ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক প্রেমের আবেদন নিয়ে এলেও বাকি সবই ধর্মসাপেক্ষ আধ্যাত্ম প্রেমের ডালিতে পূর্ণ। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো প্রায় একই সময়চক্রে বসে মধ্যযুগের অনান্য সাহিত্যের নারীদের সাথে মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাদের তুলনা। অনমনীয় ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মমর্যাদায় গীতিকার নায়িকারা মধ্যযুগের নারী মনস্তত্ত্বের পরিমন্ডল থেকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। দুঃখ পারাবারে নিমজ্জনের রূপটি হয়তো সবার ক্ষেত্রেই এক কিন্তু সন্তরনের পথটি ছিলো আলাদা। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য অন্যতম হল – শিবায়ন, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্তে আগমন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুঃখময় জীবনের চিত্র অঙ্কন, উদ্দিষ্ট দেবতার পুজা প্রচার এবং শাপমুক্তি হয়ে পুনরায় স্বর্গে গমন – এই চিরাচরিত প্রথাতে দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার হয়ে এসেছে কবিদের লেখনীতে। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকাকে দেখতে পেলাম একই সময়ে ভিন্ন স্বাদে। মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের মতো এই নায়িকাদের জীবনেও দুঃখ আছে, দুঃখের কারন আছে এবং দুঃখ থেকে নিভৃত্তির উপায়ও আছে। তবে তার প্রধান কারন কোনো দৈব নির্দিষ্ট অভিশাপ নয়, প্রেম; দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনযন্ত্রনা নয়, মানসিক বেদনাই তাদের দুঃখের কারন। এই মানসিক আকুতিতেই তারা মঙ্গলকাব্যের দৈব মঙ্গল থেকে বেরিয়েই মানবিক আবেদনে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে অপুত্রক রঞ্জাবতী প্রানত্যাগ করতে উদ্যত হলে ধর্মঠাকুর স্বয়ং দেখা দিয়ে প্রানরক্ষা করে সন্তান লাভের বর দেন। কিংবা মনসামঙ্গলে মনসার দেবীত্ব অর্জনের পুরষ্কারস্বরূপ দেবীর বরে বেহুলা তার মৃত স্বামী ও ছয় ভাসুরকে জীবিত করে ঘরে ফেরে। কিন্তু গীতিকার নায়িকাদের জীবন কখন দৈব পরিচালিত সুতোর দ্বারা অগ্রসর হয়নি। তাদের জীবন এগিয়েছে আত্মবিলাস, আত্মমর্যাদা ও পবিত্র প্রেমের মেরুদন্ডের ওপর ভর করে। গীতিকার নায়িকারা বিশ্বাস করে সেই মাহামন্ত্র – নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দেবে অধিকার, হে বিধাতা। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তায় হার না মানা অনমনীয় মানসিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের তাড়নায় ক্ষত বিক্ষত হলেও কখনো দেবতার পদে নত স্বীকার করেনি। তাই দেখি মলুয়া মৃত স্বামীর প্রান বাঁচাতে কলার ভেলা করে গাড়রী ওঝার বাড়ী গেলেও কখন বেহুলার মতো মনসার কৃপা ভিক্ষা করেনি। কিংবা প্রেমিকের নিষ্ঠুর হটকারিতায় ক্ষত-বিক্ষত চন্দ্রাবতী শিবপুজায় মনোনিবেশ করলেও তার উদ্দেশ্য জয়ানন্দকে ফিরে পাওয়া নয়, জগৎ-সংসারকে ভুলে থাকা। তাই বলা যায় গীতিকাগুলি এককথায় মানবিক রসে সহায্য। এখানে ধর্ম ভক্তির বাহুল্য নেই, আছে প্রেম সুধার উজ্জীবন। গীতিকার নায়ক-নায়িকাদের প্রেমে কোনো ভোগ বাসনার অবসর নেই, আছে প্রেম ত্যাগের সাধনার ইঙ্গিত। যুগ যুগ ধরে

বুকের কাছে বুক রেখে, কানের কাছে কান পেতে মানবজাতি যে শাশ্বত প্রেম আরাধনার গল্প শুনতে চেয়েছে, মৈমনসিংহ গীতিকা সেই গল্পের-ই আসর জমিয়ে তুলেছে পল্লীর অতিপরিচিত স্নিগ্ধ মেটো সুরে।

এখন কতকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি আলোকপাত করা যেতে পারে। এই গীতিকাগুলির আবিষ্কারে আমরা চিরাচরিত পঙ্কিল ডোবার মধ্যে জাতীয় সাহিত্যের আস্বাদ পাই। এই সকল পালায় ধ্বনিত হয়েছে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত দৈনন্দিন জীবনের নতুন দেবালয় নির্মানের বার্তা। যার আরাধনার কেন্দ্র কোনো দেবী মূর্তি নয়, মানবতা। এর আশ্রয়ে রক্ষা পায় সমাজ বন্ধন। এই সূত্রে উদাহরন হিসেবে প্রথমে মনে আসে দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া পালার' নায়িকা মহুয়ার কথা। যে হয়ে উঠেছে দুর্জয় প্রেমের শক্তির অধিকারিনী। শত রোমান্টিকতার ওপরে মৃত্যুই ছিল অবধারিত। তবুও শত পাপ-পুন্যের প্রতিকূল পরিবেশের সে তার প্রেমের দ্বীপশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে হয়ে উঠেছে নির্ভীকতায় চিরবিজয়ী। নিষ্ঠুর সমাজের চাপিয়ে দেওয়া মর্মযন্ত্রনা সহ্য করে তার প্রেম শেষ পর্যন্ত কবরের নীচে চাপা পরলেও প্রেমের মুক্তাহার গলায় পরে সে হয়ে উঠেছে মৃত্যুঞ্জয়ী।

চন্দ্রাবতী প্রণীত মলুয়া পালাটি তার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা রঞ্জিত সুখ-দুঃখের মেলবন্ধনে রচিত বলে মলুয়ার প্রেম এমন আনন্দময় হৃদয়স্পর্শী। জলের ঘাটে একাকিনী নায়কের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ও বাসর ঘরে স্বামীর সাথে আলাপে চিরাচরিত গ্রাম্য নারীর বাস্তব রসোজ্জ্বল লজ্জা আভরনকেই স্মরণ করায়। কাজীর ক্ষমতায় হঠাৎ-ই বিচ্ছেদের সুর বেজে ওঠে তাদের দাম্পত্য জীবনে। আবার মলুয়া যখন প্রতারক কাজীর কুপ্রস্তাবে প্রেরিত কুট্টনিকে মন্তব্য করে –

"রোষিয়া কহিলা মলুয়া শুনলো কুট্টনি।।
স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবান তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাঁটা তব পাক্না শিরে"।।[৩]

তখন এক পতিপ্রানা প্রতিবাদী নারী সত্তার পরিচয় পাই যে, বিশুদ্ধ প্রেমের কাছে সমাজ শাসনের নিয়মাবলীকে তুরি মেরে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। অভাব, অনটন, উৎপীড়ন, দুঃখ শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও একদিনের জন্যও ম্লান করতে পারে নি। তার পুর্বরাগ-অনুরাগ, মিলন-বিচ্ছেদের মধ্যে কোনো ধর্মের অনুশাসন এসে উঁকি দেয়নি, বরং আত্মতৃপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য নারী মর্যাদার লড়াই-ই বড়ো হয়ে উঠেছে। তাই –

> *"রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়? কৃষক-কবিরা এই প্রতিমা কোথায় পাইল?"*[৪]

কমলা পালাটিতে কমলা ও জানকীনাথের প্রেম নিয়তি নিধার্রিত এক অনির্বায পরিনতির দিকে এগিয়ে গেছে। তাদের প্রেমের স্বীকৃতি দাম্পত্য পরিণয়ে হলেও পরিশেষে নিষ্ঠুর কালচক্রের কাছে মাথানত করতে হল মৃত্যুর ছায়াপথে।

আবার কঙ্ক ও লীলা পালাটিতে বিচিত্র গতিতে প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হয়ে মানস কল্পলোকের সন্ধানে ধাবিত হয়েছে। লীলার মৃত্যুতে আমরা কোথাও ছকে বাঁধা নাগরিক কৃত্রিমতার আভাস পেলাম না, বরং লীলার পিতা গর্গর ট্র্যাজিক হাহাকার আমাদের ঘরের পিতার আর্তনাদকেই স্মরন করিয়ে দেয়। যাকে বলা যায় মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের ট্র্যাজিক হাহাকারের প্রতিরূপ। তাই আমাদের ভাবায় এই পল্লী কবিরা কতটা বাস্তব জীবন মুখী ছিলেন। যার ফলে তাঁরা ধর্মীয় বাতাবরনে বসেও মানব মনের মনস্তত্ত্বের

কারখানায় তৈরী হওয়া সুপ্ত আবেগ অনুভুতিগুলিকে সন্ধান করে গীতিকার আদলে রূপ দিয়েছেন বঙ্গ প্রেমের প্রতিচ্ছবিতে। এখানে কোনো কৃত্রিমতা ছকে বাঁধা নিয়ম বা পুরোহিত মন্ত্রপূত পরিনয় নয়, স্থান পেল ভালোবাসা, মমতা, প্রেম, সুখ, সহানুভুতির মতো মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার প্রবৃত্তি। ভালোবাসার যে কোনো জাত হয়না - এই সার্বভৌম সত্য গাথাগুলিকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তিতে উত্তীর্ণ করেছে। ধ্বনিত হয়েছে এক বিশ্বসাহিত্যের সূর।

শুধু তাই নয় কেনারামের ভক্তি, সোনাই-এর নির্বাক মৃত্যু, পাষানময়ী কাজলরেখার চিরসহিষ্ণুতা ও প্রেমের জীবন্ত সমাধি- প্রত্যেকটি চরিত্রের কাহিনী-ই সীতা-সাবিত্রীর পুরাণ গাথার মতোই হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করে পূজা পাবার যোগ্য। এই পল্লীগীতিকার নায়িকারা দেখিয়েছে সতীত্বের জন্ম কোনো আইন কানুন বা আচার্য্যের মস্তিষ্কে নয়, তার জন্ম প্রেমে। সে নিজের বলে বলীয়ান। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ গীতিকার ভুমিকা অংশে বলেছেন –

> *"এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমুহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারী প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্ত করিয়া বড় হয় নাই, - চিরকাল প্রেম বড়ো হইয়াছে। জননী রূপে তিনি জগতের বরেন্যা, স্ত্রী-রূপে তিনি জগতের প্রাণ"।*[৫]

মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে সকল কবিগণ যখন দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশের বাতাবরন থেকে বেরিয়েই আসতে পারছিলেন না। অথবা শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে নিজেদের পালা পরিবেশনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ ঈশ্বরের আশির্বাদ প্রাথর্না করাকে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত সংস্কারে পরিনত করেছিলেন তখন মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সেই চিরাচরিত প্রথাকে ভেঙ্গে মানব হৃদয়ের আত্মিক সুরকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তাই দেখি অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েও ভারতচন্দ্র যে বাতাবরনকে উপেক্ষা করতে পারেননি, সেখানে মহুয়া পালার রচয়িতা দ্বিজ কানাই একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ কবি হয়ে কৈলাস পর্বতের সাথে মক্কার বন্দনা ক'রে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিকে এক প্রীতির বন্ধনে বেঁধে দিলেন। আবার মলুয়া পালার বন্দনা অংশে চন্দ্রাবতী মা-বাবার বন্দনার সাথে যুক্ত করলেন সীতার প্রসঙ্গ। মৈমনসিংহ গীতিকার বহু পালায় দেখা যায় হিন্দু নায়িকা মুসলিম নায়ককে হৃদয়বান স্বামী রূপে বরন করে নিয়েছে। কোথাও আবার মুসলিম নায়কের প্রতি হিন্দু নায়িকার হৃদয় উদ্বেলিত পূর্বরাগটিও আমাদের চোখ এড়ায়নি। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত নিয়মাবলীর ওপরে রক্ত-মাংসের মানুষের প্রেম-ই যে সর্বোচ্চ আদর্শের বাণী – তা-ই এই গীতিকাগুলির প্রান সঞ্চারের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে। সেই কারনেই দেখি বেদের মেয়ে মহুয়া ও উচ্চ বংশের পুত্র নদের চাঁদের সীমা লঙ্ঘন ভালোবাসা, গজদানী ও মমিনা খাতুনের ভালোবাসার উচ্চস্তর পরিনতি বা ব্রাহ্মণ পালানায়ক জয়চন্দ্র ও এক মুসলমানীর প্রেমগাথা গথিত হয়েছে। অর্থাৎ গীতিকাগুলিতে নায়ক-নায়িকারা 'প্রেম' নামক এক মহার্ঘ্য বাস্তব বস্তুকে অবলম্বন করে তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজের ধর্মের বন্ধনকে ভেঙ্গে ফেলেছে। ধ্বনিত হয়েছে স্বাধীন মুক্ত প্রেমের জয়গান। তাই –

"প্রেম ভিন্ন ইহাদের ধর্ম নাই - পরস্পরের সাহচর্য ভিন্ন ইহারা কোনো গৃহসুখ কল্পনা করে নাই"[৬]

সংস্কৃতি আমরা সেই বিষয়কে বুঝি যার মাধ্যমে মানুষ তার মনন, রুচি ও সৃজন ক্ষমতার একত্রিত রূপ প্রকাশ করে। তবে এই সংস্কৃতি কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র পরিমন্ডলের আয়ত্তাধীন নয়; তা বাংলার লোকজীবন, সংস্কৃতি, রুচি ও নিজস্বতার সমষ্টিবদ্ধ সুঘ্রানের ফল। 'লোক-সংস্কৃতি' কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই 'লোক' এবং 'সংস্কৃতি' – এই দুই শব্দ মুলত ইংরেজি শব্দ folk lore & folk culture শব্দের

প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় লোক-সংস্কৃতি শব্দটির প্রচলন হয়েছে। এককথায় বলা যায় ঐক্যবদ্ধ আদিম জনগোষ্টি থেকে সময়ের পরিবর্তন ধারায় জীবন বিকাশের পথ ধরে লোকালয় সংহত সামাজিক পটভুমিতে লোকসংস্কৃতির জন্ম। আলোচনা অগ্রসরের সাথে সাথে দেখবো মৈমনসিংহ গীতিকা কতখানি বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পেরেছে। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধারাপাতে জীবিকা, খেলা, অভিনয়, অনুষ্ঠান, পোশাক, খাদ্যাভাস, অলংকার সজ্জা, শৈল্পিক চেতনা, লোক ধর্মবিশ্বাস – এই সবই কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাতায় লোকসংস্কৃতির আবেদন নিয়ে আসে। তাই মৈমনসিংহ গীতিকায় মহুয়া পালায় দেখি ভ্রাম্যমান বেদের সর্দার হুমরা বেদে ছয় মাসের শিশুকন্যা মহুয়াকে চুরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমরূপ খেলা প্রদর্শনের বিভিন্ন কৌশলগুলির তাকে শেখাতে লাগল। আবার লোকমানসের শিল্প সচেতণতার প্রকাশ হিসেবে যেমন মহুয়া পালায় চৌকারী বা চারচালা ঘরের উল্লেখ আছে –

"নয়া বাড়ী লহিয়ারে বহিদ্যা বানালো চৌকারী।
চৌদিগে মালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি।।"

তেমনি দেওয়ান ভাবনা পালায় ধনী গৃহস্থের বিলাসের অঙ্গস্বরূপ গ্রীষ্মকালে আমোদ-প্রমোদের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে গৃহ নির্ম্মিত জলটুঙ্গী বা বৈঠকখানাঘরে কামটুঙ্গীর উল্লেখও দেখা যায়। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাসও তাদের লোকসংস্কৃতির নিজস্বতার পরিচয় বহন করে। তাই তাদের রন্ধন ও ব্যঞ্জনের তালিকায় দেখা যায় – সবরীবালা, সালিধানের চিড়া (মহুয়া পালা), মানকচু ভাজা, চালিতার আচার, কইমাছের চরচরি প্রভৃতির পাশাপাশি পিউপুলির ও বর্ণনা পাই মহুয়া পালায়। লোকসংস্কৃতি যখন কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রাতিরূপে প্রমানপত্র হয়ে ওঠে তখন সেই সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত সামাজিক অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কারও তার দ্যোতক হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায় গীতিকাগুলিতে বিবাহ অনুষ্ঠানের চিহ্নস্বরূপ নান্দিমুখ, কালরাত্রি যাপন, কড়ি খেলা, দধিমুখ-এর মতো নানা সামাজিক রাতির পাশাপাশি সংস্কারের মঙ্গলকামনায় দেবতার পদে মানত বা অভিষ্ঠ পুরনের জন্য লৌকিক প্রথার ইঙ্গিতও মেলে গীতিকাগুলিতে। তাই সর্পঅধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে মনসা দেবীর পূজার প্রচলনের পাশাপাশি দূর্গা, ষষ্ঠী, রক্ষাওকালী পূজা প্রচলনের কথাও আমরা জানতে পারি।

মানব জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নিবিড় সংযোগ। মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের হাত ধরাধরি করে একে অপরের পরিপূরক, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই কারনে বলা যায় প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে জীবনের যে সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তা খন্ডিত, মলিন। তাই যে সাহিত্য জীবন অখন্ডতার দাবি রাখে সেখানে মানুষ ও প্রকৃতি অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা থাকে। পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি তেমন-ই এক সাহিত্যের নিবেদন। এই গীতিকাগুলি বাংলার মাটিতে উর্বর। সাহিত্যের উপাদানও মাটির মানুষ। আর এর কবিমনও সৌন্দর্যের পায়ে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গীতিকাগুলিতে পল্লীবাংলার প্রাকৃতিক শোভা স্বতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই দেখা যায় চিরপরিচিত দৃশ্যের মধ্যে পালার নায়ক-নায়িকারা যখন কর্মব্যস্ত তখন বর্ষার কদম্ব, মান্দার গাছের ডালে ঘেরা কদলীবন, নদীর ধারে কেয়াফুলের ধার, বউ কথা কও পাখির করুণ সুর কাব্যে বর্নিত কর্মকাঠামের মাঝে উঁকি দিয়ে শ্রম ও চোখের তৃপ্তি ঘটিয়ে গেছে। আবার দেখা যায় এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা অনুভব করেছে গ্রামের নির্মল পরিবেশে বাঁশ-জাম-আম বনের ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা, অনুভব করেছে মাটির নমনীয়তা, কান পেতে শুনেছে পাখির তৃপ্তিদায়ক কলকাকলি। এই গীতিকাগুলির প্রতি মোড়ে মোড়ে প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছে অজস্র মুহূর্তের মেলবন্ধন, হাজার

গল্পের সারি। সেই ছড়িয়ে থাকা গল্প গুলিকে নিয়েই প্রকৃতি ও মানুষকে মুখোমুখি বসিয়ে গীতিকাগুলি জীবনের পসার সাজাতে বসেছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা পল্লীভাষার পঙ্কে জাত পদ্মফুল। বঙ্গদেশের পূর্বতন প্রান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই গীতিকার জন্ম হলেও তার সৌরভ সমগ্র পৃথিবীকে আমোদিত করে তুলেছে। গীতিকার রচয়িতারা জীবনমুখী বাস্তবতা প্রিয় হলেও অরসিক বস্তুবাদী ছিলেন না। তাদের সূক্ষ দৃষ্টি ও জাগ্রত মন সর্বদা মানব মনের কারখানায় নিয়ত তৈরী হওয়া লোহার পিটুনি ও হাপরের কাদুঁনীকে টেনে বের করে এনেছেন। মানব চরিত্রের নিগূঢ় ঈঙ্গিত, প্রেম প্রেমিকার আড়চোখের চাউনি, কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রকৃতির তৃপ্তিদায়ক লীলা-বিলাস তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মধ্যযুগের প্রচলিত ধারা যখন তর্ক বহির্ভূত ঈশ্বর বিশ্বাসে গা ভাসালো তখন এই গীতিকাগুলি দায়িত্ব নিলো মানব হৃদয়ের প্রেম, সংযম ও সহিষ্ণুবোধের। তাই ধর্মীয় সংস্কারের কঠোর নিষেধাজ্ঞায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবক্তাগন যখন প্রেমকে সমাজ গন্ডির বাইরে দূরীভূত করতে ব্যস্ত তখন সেই প্রেমকেই সরলতার মোড়কে নিঃস্বার্থ প্রেম পুজারীর মুকুট পরিয়ে পল্লী গীতিকার কবিগন সাদরে আমন্ত্রন জানাতে ব্যাকুল। সেই কারনে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন –

> *"মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণের বিশিষ্টতা এইখানে যে, বাস্তব সত্যের তুচ্ছতার মধ্য দিয়াও তাঁহারা কাব্যকে দেখাইতে সংঙ্কুচিত হন নাই – জীবনের মধ্যেই প্রেম ও প্রকৃতিকে দেখাইয়াছেন; সেই জন্যই উহারা কেবল মনকে নহে, হৃদয়কেও স্পর্শ করে"।*[৭]

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য্য, তারাপদ, মৈমনসিংহ গীতিকা, তবু একলব্য, কলকাতাঃ দেবারতী মালিক, ২০১৮, পৃষ্ঠা নং-৬৩.
২. সেন, দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, তবু একলব্য, কলকাতাঃ দেবারতী মালিক, ২০১৮, পৃষ্ঠা নং-৩৬.
৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং-৩৬.
৪. সেন, দীনেশচন্দ্র, কর্তৃক সংকলিত, মৈমনসিংহ গীতিকা, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতাঃ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং-৭.
৫. তদেব, ভুমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং-৮.
৬. তদেব, ভুমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং-১৩.
৭. তদেব, ভুমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং-১৫.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ন ইতিবৃত্ত, দশম পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতাঃ মডার্ন বুক, ১৯৯০.
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় পর্ব, কলকাতাঃ মর্ডান বুক, ১৯৬৬.
৩. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করন, প্রথম খন্ড, কলকাতাঃ ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২.

৪. চক্রবর্তী, বরুনকুমার, গীতিকাঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কলকাতাঃ পুস্তক বিপনি, ১৯৯৩.
৫. চট্টোপাধ্যায়, কেয়া, সম্পাদিত, মৈমনসিংহ গীতিকাঃ নব আলেখ্য, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৫.
৬. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, সম্পাদিত, মৈমনসিংহ গীতিকা, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতাঃ ভারতী বুক, ১৯৯৩.
৭. মৌলিক, ক্ষিতিশচন্দ্র, সম্পাদিত, প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম সংস্করণ, প্রথম খন্ড, কলকাতাঃ ফার্মা, ১৯৭০.
৮. মৌলিক, ক্ষিতিশচন্দ্র, সম্পাদিত, প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খন্ড, কলকাতাঃ ফার্মা, ১৯৭৫.
৯. সেন, দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮.